



**সহরায় পরবের দর্পনে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি :
একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক পর্যালোচনা**

ড. অঞ্জন কর্মকার

সহকারি অধ্যাপক, সাঁওতালি বিভাগ

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

anjankarmakar2026@gmail.com

বিমূর্ত (Abstract):

ভারত তথা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদিমজাতি হল সাঁওতাল। তারা নিজেদের 'হড়' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। ভারতবর্ষ ছাড়াও বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে তাদের বসবাস। সাঁওতালদের আদি পেশা ছিল শিকার ও বনের ফল-মূল সংগ্রহ। এখনও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তারা জীবজন্তু শিকার করে। তারা ঐতিহ্যগত যে সমস্ত হাতিয়ার ব্যবহারকরে সেগুলি হল 'আঁক-সার' (তীর-ধনুক), গুলতি (বাঁটুল), বরলম (বর্ষা), কৌপি (টোঙ্গি) প্রভৃতি। তবে ক্রমে তারা কৃষিজীবী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন নাহেল (হাল), আঁরাড় (জোয়াল), আড়গম (মই) প্রভৃতি তৈরি করতেও বিশেষ পটু। এই কৃষি সরঞ্জাম গুলি দিয়ে তারা কৃষিকার্য সম্পাদন করে। লাঙ্গল দিয়ে জমি কর্ষণের পর তারা অনেক রকমের ধান তাছাড়া গম, যব, ডাল, ভুট্টা ও নানা জাতীয় শাক-সব্জী চাষ করে। কৃষি কেন্দ্রীক বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান তারা পালন করে। তার মধ্যে সব থেকে বড় উৎসব হল সহরায়। ধান তোলায়পর কৃষি-সরঞ্জাম ও গবাদিপশুকে কেন্দ্র করে এই উৎসব পালিত হয়। নাচ-



গান আর ‘তুমদৌঃ-টামাকে’র (ধমসা-মাদলের) মুর্ছনায় চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে সহরায় পরবের দর্পনে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস করা হল।

সূচক শব্দ (Keywords) : উৎসব, সহরায়, নৃত্য-গীত, সংস্কৃতি, সমাজ, কৃষি।

বিশ্লেষণ (Discussion) :

সাঁওতাল জাতির সর্বোৎকৃষ্ট পরব হল সহরায়। এই পরবকে হাতির সঙ্গে তুলনা করা হয়। ‘সহরায়’ শব্দের অর্থ হল একটি মাস বিশেষ। ‘সহরায়’ (কার্তিক) মাসে যে পরব উদযাপন করা হয় তা হল ‘সহরায় পরব’। সাঁওতাল সম্প্রদায় প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা ও রূপচিত্র, ফুল-ফল, কৃষি ও সামাজিক কাজ-কর্ম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মাসের নাম করণ করেছে। যেমন- ‘বাহা চাঁদো’ অর্থাৎ বাংলাতে ‘ফাল্গুন মাস’, ‘বাহা’ শব্দের অর্থ হল ফুল। এই সময়ে প্রকৃতি নবপুষ্পের সমারোহে ভরে ওঠে। তেমনি সহরায় শব্দটি সহর + আয় = ‘সহরায়’ হয়েছে। ‘সহর’ শব্দের অর্থ হল কোনো কিছু বেরিয়ে আসা। সম্ভবত ধান রোপনের পর ‘সহরায় চাঁদো’তে (কার্তিক মাসে) ধানের গাছি থেকে ধানের শিষ বেরিয়ে আসে; তাই এই মাসটিকে ‘সহরায়’ নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। ‘সহরায়’ পরবের যেমন সম্পর্ক আছে ‘সহরায় চাঁদো’ অর্থাৎ কার্তিক মাসের সঙ্গে, তেমনি ধানের তথা ধান চাষের সঙ্গেও সম্পর্ক রয়েছে এই পরবের। সহরায় সংগীতেও আমরা এই প্রসঙ্গটি পায় –

“নুমিন দিন দ সীরি সহরায়

তকারেদম তাঁহেকান তকারেদম আঁগা-আঁয়ুবলেং

বীদ-বীয়হীড় তালারে হুড়ু-গীছি দানাংরে

অঁডেগেচোএঃ তাঁহেকান



অঁড়েগেচোঞা আঁগা-আঁয়ুবলেং।”

(মুরমু)

(সহরাই সেরেঞা)

তরজমা :

এতদিন সহরায় তুমি কোথায় ছিলে বলো,

কোথায় বা তুমি দিবা-নিশি কাটিয়ে ছিলে বলো

বাইদ-বহালের মাঝে, ধান গাছির আড়ালে

সেখানেই আমি তো ছিলাম

সেখানেই দিবা-নিশি কেটেছে আমার।

(সহরায় সংগীত)

সহরায় পরবের প্রধান লক্ষ্য হল অধিক শস্য প্রাপ্তি, বৃষ্টি, সন্তান ও গো-সম্পদ কামনা। শীতকালীন ফসল তোলার আনন্দে এই উৎসব। পঞ্চ দিবা পঞ্চ নিশি পূজার্চনা, খাওয়া দাওয়া, নৃত্য-গীতের মূর্ছনায় মুখরিত হয় চারিদিক। সহরায় পরবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত রকমের সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়মকানুন অত্যন্ত আন্তরিকতা ও কঠোরতার সাথে গ্রামের মাঝি বাবার (গ্রাম-প্রধান) নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রথমে গ্রামের ‘মাঝি বাবা’র (গ্রাম-প্রধান) নেতৃত্বে সকলে ‘মাঝি-থান’ নামক স্থানে একত্রিত হয়। সেখানে গ্রাম পরিচালনার দায়িত্বভার যাদের উপর ন্যস্ত থাকে তারা সকলে উপস্থিত থাকেন যেমন - পারাণিক, গোডেং, জগ-মাঝি, নায়কে এবং কুডীম নায়কে। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সহরায় পরবের দিনধারণ করা হয়। পাঁচ দিন ধরে পালিত এই পরবের এক একটি দিনের জন্য নির্দিষ্ট ভাবে নামকরণ করা রয়েছে। যেমন প্রথম দিন : ‘উম-নাড়কা মাহা ও গট বোঁগা’ অর্থাৎ ‘পুণ্যম্ভান ও গট



পূজোর দিন’, দ্বিতীয় দিন : ‘বোঁগা-বুরু মাহা’ অর্থাৎ ‘পূজার্চনা ও অর্ঘ্য নিবেদনের দিন’, তৃতীয় দিন : ‘খুন্টাউ মাহা’ অর্থাৎ ‘গরু বা মোষকে খুঁটিতে বেঁধে নাচানোর দিন’। চতুর্থ দিন : ‘জালে মাহা’ অর্থাৎ ‘রঙ্গ-রসিকতা ও আনন্দ উল্লাসের দিন’ আর পঞ্চম দিন : ‘অড়াঃ জালে’ অর্থাৎ ‘বাড়ি বাড়ি গিয়ে রঙ্গরসিকতা ও আনন্দ উল্লাসের দিন’।

দিন ধার্য হওয়ারপর থেকেই শুরু হয়ে যায় সহরায় পরবের প্রস্তুতি। বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি মহিলারা লালমাটি দিয়ে দেওয়ালের এবড়ো-খেবড়ো অংশগুলি মসৃণ করে তোলে। এরপর সেই মাটির দেওয়ালের গায়ে নানা ধরনের ফুল, গাছপালা, পশু-পাখি ও বিভিন্ন জীবজন্তুর আকৃতি ফুটিয়ে তোলে। এ ধরনের মাটির কারুকার্য ‘রিলিফ’ শিল্প নামে পরিচিত। এছাড়াও অনেক বাড়ির দেওয়াল সাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে ক্যানভাসের মতো মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন করারপর সেই দেওয়ালের উপর প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে বিভিন্ন চিত্রের সমাহারে বাড়ি গুলিকে চিত্রাকর্ষক করে তোলে। এই ধরনের দেওয়ালচিত্র ‘ফ্রেস্কো’ নামে পরিচিত। সহরায় পরবকে কেন্দ্র করে বাড়ির দেওয়ালে এভাবেই সাঁওতাল নারীরা তাঁদের সৃজনশীলতা, নান্দনিক বোধ ও বংশপরম্পরায় বহমান শিল্পঐতিহ্যকে মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুটিয়ে তোলে। অন্যদিকে, পুরুষেরা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমন্ত্রণের বার্তা পৌঁছে দেয়। এইভাবে ঘর সাজানো, দেওয়ালচিত্র নির্মাণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে সহরায় পরবের আবহ ধীরে ধীরে সমগ্র সাঁওতাল পল্লিতে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকে মুখরিত হয়ে সাঁওতাল পল্লী থেকে ভেসে আসে সহরাই-এর আবাহনী সুর –

“দৌই না দৌই ! মারাং দৌই

দেলা সে, দৌইনা নোডোং লেনমে,

ইতি লেকান পরব দৌই নায় সেটের



হিজুঃ কান, না দৌই !

নাম দৌই না ধুবি ঘাঁস
নিঞ দৌই না ! আদওয়া চাওলে,
হাঁতি লেকান পরব দৌইলাং নাতাং
নাদেরে, না দৌই !”

(সাহু, ১৯৯৮)

(সহরায় সেরেঞঃ)

তরজমা :

বড় দিদি ওগো বড় দিদি
বেরিয়ে এসো, একটু বেরিয়ে এসো,
হাঁতির মতো পরব দিদি
ঐ যে আসিতেছে।

তুমি নাও গো দূর্বা ঘাস
আমি লইবো আতব চাল
হাঁতির মতো পরবকে দিদি
বরন করে নেব।
(সহরায় সংগীত)



এদিকে সহরায় পরবের জন্য ধার্যদিন গুলি এগিয়ে আসতে থাকে। প্রথম দিন পবিত্র জলাশয়ে পূণ্য স্নানের মধ্য দিয়ে সহরায় পরবের সূচনা হয়। এই পবিত্র স্নান হরপ্পার অধিবাসীদের সেই বৃহৎ স্নানাগারে পূণ্য স্নানের কথা স্মরণ করে দেয়। “সম্ভবত রাজকীয় পূণ্য অবগাহনের মতো কোনো ধর্মীয় প্রথার জন্য এই ব্যবস্থা।” (রত্নাগর, ২০১৮) সহরায় সঙ্গীতে এই পূণ্য অবগাহনের কথা পাওয়া যায় এইরূপ –

“তেহেএঃ দলে নুম কানা

দোলবাদোল পুখুরি

গাপা দলে বোঁগানা

দারাহারা চাতম নড়াঃরে ।”

(সাহু, ১৯৯৮)

(সহরায় সেরেএঃ)

তরজমা :

আজকে মোরা স্নান করি

পবিত্র জলাশয়ে,

কালকে মোরা অর্ঘ্যদেব

বড় বাড়ির ভেতরে ।

(সহরায় সংগীত)



পূণ্য স্নানের পর নায়কে (পুরোহিত বা পূজারী) গ্রামের বাইরের ‘গট-টাঁড়ি’ অর্থাৎ চারণভূমি সংলগ্ন ফাঁকা মাঠ বা সমতলভূমি অর্থাৎ যেখানে গবাদি পশুদের রাখা হয় সেখানে পূজোর সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হন। কিছু অংশ পরিস্কার করার পর গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে দেন। তারপর পূর্ব দিকে মুখ করে বসেন এবং উত্তর দক্ষিণে ডান দিক থেকে বাম দিকে ‘খঁড়’ আঁকেন। তিনটি, পাঁচটি আবার কোথাও সাতটি খঁড় আঁকার প্রচলন রয়েছে। একটি খঁড়-এর মাঝে চালের গুঁড়ি দেন এবং তার উপর একটি ডিম সোজাসুজি করে বসান। তারপর এক এক করে ‘জাহের এরা’, ‘মারাঙ-বুর’, ‘মড়ে ক তুরুইকো’ নামক ‘বোঁগা-বুরু’ বা দেবতাদের এক একটি করে মুরগি বলিদেন। তারপর গ্রামের সকলে মিলে প্রসাদ রান্না করে একত্রে খায়। প্রসাদ খাওয়ার পরে মাঝি বাবা গ্রামের সকলকে সহরায় পরব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার জন্য পরামর্শ এবং আদেশ দেন।

তারপর রাখাল ছেলেরা গ্রামের সমস্ত গরু ও গাই গুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে ঐ ‘খঁড়’-এ রাখা ডিমের দিকে। সর্বপ্রথম যে গরু ঐ ডিম টিকে শূঁকে বা খুর দিয়ে মাড়িয়ে ফেলে সেই গরুটিকে চিহ্নিত করে তাকে ধরে নিয়ে তার পা জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়, শিং-এ তেল ও সিঁদুর মাখানো হয়। আর ঐ গরুটি যে রাখাল ছেলের তাকে কাঁধে করে মাঝি বাবার কাছে নিয়ে আসা হয়। সেই রাখাল ছেলেটি প্রথমে মাঝি বাবাকে প্রণাম করারপর গ্রামের অন্যদেরকে প্রণাম করে।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে নায়কে (পুরোহিত বা পূজারী) তার পূজার সামগ্রী নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা দেন। তার পিছনে গ্রামের সমস্ত লোক ‘তুমদীঃ- টামাক’ (ধমসা-মাদল) বাজাতে বাজাতে গ্রামে ফিরে আসে। মাঝি বাবা সেদিন ‘জগ-মাঝি’ ও ‘পারানিক’কে গ্রামের সমস্ত ছেলে-মেয়েদের নজরে রাখা এবং সহরায় পরব সুষ্ঠুভাবে সু-



সম্পন্ন করার দায়িত্ব অর্পন করেন। তাদের বলেন – ‘যেন কোনো রকম ব্যঘাত সৃষ্টি না হয় আর কিছু হলে তার জবাবদিহি করবা।’

সেদিন মহিলারা বাড়ির যে রাস্তা দিয়ে গরু গোয়ালঘরে প্রবেশ করে সেই রাস্তা জুড়ে চালের গুঁড়ি দিয়ে আলপনা আঁকে এবং তার উপরে ঘাঁস ছড়িয়ে দেয়। তাছাড়া দেওয়ালে হাতের ছাপ আঁকে। “সাদা রঙ শুভ শক্তির প্রতীক। বাঁধনা উৎসবের সময় সারা আঙিনা জুড়ে আলপনা দেওয়া হয়। মেয়েরা দরজার চৌকাঠে দরজার বাইরে দু’পাশের দেওয়ালে পিটুলীগোলা দিয়ে হাতের ছাপ আঁকে... কারণ হাতের ছাপ রক্ষাকবচের মূর্ত প্রতীক।” (বাস্কে, ২০২১) তাছাড়া গোয়াল ঘরে মহিলারা প্রদীপ জালে আর ছেলেরা গরু-মোষের শিং-এ তেল দেয়। রাত্রীবেলা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাজ-বাজনা সহ গরু জাগায়। শুরু হয় মাঝিবার বাড়ি থেকে। তারা গান গায় -

“কো নীহি সিরিজালা, বোমা কা পিরথিমিহো,

কো নীহি সিরিজালা, গাইয়া জোওয়ারে;

কো নীহি সিরিজালা, গাইয়া জোওয়ারে।

ঠাকুরীহি সিরিজালা, বোমা কা পিরথিমি হো,

ঠাকুরীহি সিরিজালা, গাইয়া জোওয়ারে

ঠাকুরীহি সিরিজালা, গাইয়া জোওয়ারে।”

(ক্লেফসরুড, ২০১০)

(সহরায় সেরেঞ)



তরজমা :

কে বা সৃষ্টি করলেন, এই মহা পৃথিবী;

কে বা সৃষ্টি করলেন, গাইয়া জোওয়ারে;

কে বা সৃষ্টি করলেন, গাইয়া জোওয়ারে;

ঠাকুরজি সৃষ্টি করলেন, এই মহা পৃথিবী;

ঠাকুরজি সৃষ্টি করলেন, গাইয়া জোওয়ারে;

ঠাকুরজি সৃষ্টি করলেন, গাইয়া জোওয়ারে।

(সহরায় সংগীত)

এভাবে গ্রামের এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে চলে সারারাত ধরে জাগরণীর গান। মেয়েরাও দলবেঁধে প্রথমে মাঝি বাবার বাড়িতে যায়। সেখানে আতপ চাল, দুর্বাঘাস আর প্রদীপ সহযোগে গো-বন্দনা শুরু করার পর গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যায়। এভাবে ছেলে এবং মেয়েরা সমস্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে গো-বন্দনা সমাপ্ত করে। তারপর কুলহির মাঝে সহরাই-নৃত্যগীত প্রদর্শন করে। তবে তখন আর গো-বন্দনার গান না গেয়ে জীবের সুখ- দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, প্রেম-বিরহের গান গায়তে গায়তে, মেয়েরা অর্ধ-বৃত্তাকারে হাতে হাত ধরে এক সাথে তুমদীঃ-টামাকের (নাগাড়া-মাদল) তালে তালে নাচতে নাচতে রাত শেষ হয়ে যায় এবং সকলে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে আসে। এভাবে সহরায় পরবের প্রথম দিবস এবং রজনী সমাপ্ত হয়।



সহরায় পরবের দ্বিতীয় দিন ‘বোঁগা-বুরু মাহা’ অর্থাৎ ‘পূজার্চনা ও অর্ঘ্য নিবেদনের দিন’। এই দিন বাড়ির মহিলারা গোবর দিয়ে নিকিয়ে পরিস্কার করারপর স্নান করে এসে চালের গুঁড়ি তৈরী করে। সেই চালের গুঁড়ি দিয়ে পিঠা তৈরি করে। বাড়ির পুরুষ মানুষরা স্নান করে এসে মারাঙ বুরু এবং টোটম ভিত্তিক নিজ নিজ গোষ্ঠীর গৃহদেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজার্চনা ও পিতৃপুরুষদের অর্ঘ্য নিবেদন করে। “মৃত্যুর পর আত্মা বা বংশপিতাকে তুষ্ট করার বিধান আদিবাসি সমাজে আছে। পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট রাখতে পারলে সুখে-স্বাচ্ছন্দে বাস করা যায়। পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে বংশবৃদ্ধি হয়, গরু-মহিষ বৃদ্ধি পায়, ক্ষেতে-খামারে ফসলের ফলন বাড়ে।”(বাক্কে, ২০২১)

সেদিন খাওয়া দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। মোরগ এবং শুকের মাংস রান্না করা হয় তাছাড়া চালের গুঁড়ি এবং মাংস শালপাতার মধ্যে লেপে আগুনের তাপে পিঠা তৈরী করা হয় যা ‘পাতড়া পিঠা’ নামে পরিচিত। খাওয়া দাওয়ারপর সকলে মিলে সহরায় নৃত্য-গীতে অংশ গ্রহণ করে। এদিন নাচ-গান এবং বাজ-বাজনা অর্থাৎ তুমদাঃ (মাদল), টামাক (নাগাড়া), তিরয়ো (বাঁশি) বানাম (বেহালা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র) প্রভৃতি সহযোগে সুরের মুর্ছনায় মুখরিত হয় আকাশ-বাতাস। গান গায় –

“বুরু বুরু পারম খন

গেলবারবুরু পারম খন

মারাং দাদাম নেওতা আকাদিঞ;

বীঞ খজা ধন-দুরিব

বীঞ খজা জিল দাকা,

গাতে কুড়ি সাঁওতেগেঞ



এনেচ সেরেঞা।”

(মুরমু)

(সহরাই সেরেঞা)

তরজমা :

পাহাড়ের পর পাহাড়, পেরিয়ে,

বারোটি পাহাড় পেরিয়ে,

বড়দা আমায় আমন্ত্রন করে এনেছো -

ধন দোলত চাই না আমি,

চাই না আমি মাংস-ভাত

সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে আমি

নাচে গানে কাটাব।

(সহরাই সংগীত)

বাড়ির বিবাহিতা এক কন্যাকে আবাহন করে পিত্রালয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। সে তার দাদাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এই সহরায় গানটিতে। এই পরবে বিবাহিতা কন্যাদের পিত্রালয়ে আবাহন করে নিয়ে আসা হয়। তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে প্রতিটি বাড়ি আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। এই কারণে সহরায় পরব সাঁওতাল সমাজের একটি উৎসব নয়, বরং এটি পারিবারিক পুনর্মিলন, আত্মীয়তা ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় এবং পুনরুজ্জীত করার একটি মহা মিলন ক্ষেত্র।



সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীর সামাজিক ভূমিকা ও বিশেষ মর্যাদার রয়েছে তার সাংস্কৃতিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সহরায় পরবের সময় বিবাহিত কন্যাদের আবাহন করে নিয়ে আসার প্রথাটি তারই একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এই রীতিটির মধ্য দিয়ে সমস্ত নারী জাতিকে মাতৃতুল্য সম্মান দেওয়া হয়। এই অবক্ষয়ী সমাজের চারিদিকে নারী নির্জাতন, ধর্ষণ ও খুনের মতো অতি পাশবিক ঘটনায় মানব কূল অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে এই ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ একটি সুস্থ-সমাজ গঠনের দিশা দিতে পারে।

সাঁওতাল জাতি নৃত্য-গীতে বিশেষ পারদর্শী। সহরায় পরবের সময় তা যেন সর্বসমুখে সর্বাধিক প্রাণবন্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। তারা এই পরবে অসংখ্য গান পরিবেশন করে থাকে। গানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, প্রেম-বিরহ তাছাড়া জীবনতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি। গ্রামের উপরপাড়া থেকে নামোপাড়া নৃত্যগীত প্রদর্শন করতে করতে একবার যায় এবং একবার ফিরে আসে। এভাবে গ্রামের উপরপাড়া থেকে নামোপাড়া পর্যন্ত নৃত্য-গীতের মাধ্যমে এই পরবের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। দলবদ্ধভাবে একবার যাওয়া এবং পুনরায় ফিরে আসার এই ধারাবাহিকতায় রাত কখন যে ভোরে পরিণত হয়, তা অংশগ্রহণকারীরা অনুভবই করতে পারে না। ফলে সহরায় পরবের নৃত্য, গীত, পারিবারিক পুনর্মিলন ও সামাজিক সম্প্রীতির এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রকাশ হিসেবে সাঁওতাল জীবন ও সংস্কৃতিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

সহরায় পরবের তৃতীয় দিন 'খুন্টাই মাহা' অর্থাৎ খুঁটিতে বেঁধে খেলা দেখানোর দিন। এদিন ছেলেরা সকালবেলা গ্রামের কুলহির মাঝে খুঁটি পুঁতে। তারপর যে গরু বা মোষকে খুঁটিতে বেঁধে খেলানো হবে তার গায়ে নানা ধরনের ছাপ দেওয়া হয়। এগুলি টোটাম চিহ্ন বলে মনে হয়। তাছাড়া শিং-এ তেল ও সিঁদুর দেওয়া হয় এবং গলায় ফুলের



মালা পরিয়ে সাজানো হয়। তারপর গ্রামের কুলহিতে পোঁতা ঐ খুঁটিতে বেঁধে নাগাড়া বাজিয়ে গরু খেলানো হয়। চামড়া নিয়ে আবদ্ধ গরু বা মোষের নাকের কাছে দোলায় এবং গান গায়। এভাবে বিকেল হয়ে আসে তখন গরু এবং মোষ গুলোকে শান্ত করে গোয়ালে নিয়ে যায়। পরেরদিন সকালবেলা সেই খুঁটি গুলোকে তুলে নেওয়া হয়।

সহরায় পরবের চতুর্থ দিন ‘জালে মাহা’ অর্থাৎ ‘রঙ্গ-রসিকতা ও আনন্দ উল্লাসের দিন’। এদিন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে সহরায় নৃত্য-গীতে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। আনন্দ-উল্লাসে এভাবেই মুখর হয়ে ওঠে সমস্ত গ্রাম। তারসাথে চলে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়, রঙ্গরসিকতা। গ্রামের যুবক-যুবতিরা নৃত্যগীত পরিবেশনের সাথে প্রত্যেক বাড়ি থেকে কচু (সারু), বেগুন, সিম, পেঁপে, লাউ, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করে আর সন্ধ্যা বেলা খিচুড়ি রান্না করে সকলে মিলে খাই।

সহরায়-এর পঞ্চম দিন ‘অড়াঃ জালে’ অর্থাৎ ‘বাড়ি বাড়ি গিয়ে রঙ্গরসিকতা ও আনন্দ উল্লাসের দিন’। এদিন নর-নারী এবং বৃদ্ধারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নৃত্য-গীত পরিবেশন করে, সৌহার্দ বিনিময় করে। আর এই দিনেই ‘জগ-মাঝি’ আনুষ্ঠানিকভাবে সহরায় পরবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সেদিনের গানে বিষাদের সুর ধ্বনিত হয় –

“দেসে দীইনা জাঁড়ি জোতে

দেসে দীইনা সিলি বাবের

হীতি লেকান সহরায়

দীইলাং তল দহয়ে।”

(মুরমু



(সহরাই সেরেএঃ)

তরজমা :

দাওনা দিদি পাঘা-দড়ি

দাওনা দিদি শক্ত দড়ি

হাতির মতো সহরায়কে দিদি

বেঁধে রেখে দেব।

(সহরাই সংগীত)

উপসংহার (Conclusion) :

সহরায় চাঁদো অর্থাৎ কার্তিক মাসের আগমন সাঁওতাল জাতির জীবনে নিয়ে আসে নতুন ফসল প্রাপ্তির আনন্দ এবং সমৃদ্ধির প্রত্যাশা। এই সময় দিগন্তজোড়া প্রকৃতি ছেয়ে যায় সোনালি ধানের ক্ষেত। সোনালি ধানের রং কৃষিজীবী সাঁওতাল জাতিকে আনন্দে বিভোর করে তোলে। এই আনন্দের কারণ, তাদের ঘর ভরে উঠবে গোলাভরা ধানে। সাঁওতাল সমাজে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়, সহরায় তার মধ্যে অন্যতম। এটি ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব, সহরায় শুধু পরব নয় এটি তাদের সমাজ-সংস্কৃতির একটি অনবদ্য নিদর্শন।

সহরায় পরবের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, নৃত্য-গীত ও লোক-বিশ্বাসের মধ্যে সাঁওতাল সমাজের আদিম ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরম্পরা, শিল্প-সুসমা, সংগীত, নৃত্যকলা, সামাজিকতার দৃষ্টান্ত, সংস্কার ও ধ্যান-ধারণা, কামনা-বাসনা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ধর্মীয়-ভাবনা, গো-বন্দনা, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন, সাম্য,



Journal of Cultural Research Studies

Volume V, Issue I, 2026. (ISSN 2583-6137)

A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary

Online Open Access Journal. Published by **DRAFT**



ভ্রাতৃত্ববোধ সম্বলিত সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির জলছবি প্রতিফলিত হয়। তারফলে সহরায় কেবল একটি পরব নয়, এটি সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।



তথ্যসূত্র (Reference)

- মুরমু, মোহনচন্দ্র, ৬৩, গ্রাম - দেউলি - রাঙ্গাডি, ডাকঘর - হুড়া কেশবপুর, থানা - হুড়া, জেলা - পুরুলিয়া
সাহু, ড. (১৯৯৮) ডমন 'সমীর', হুড় সেরেঞ, জনতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কালিবাবু স্ট্রীট, রাঁচি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি
১৯৯৮, পৃষ্ঠা -১, ৪
রত্নাগর, শিরিন (২০১৮), হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা - ৮৫
বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ (২০২১), বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক - বৈদিক প্রভাব, বাস্কে পাবলিকেশন, ১৮/১ শান্তিনগর, রিজেন্টপার্ক,
কলকাতা ৭০০০৪০, তৃতীয় প্রকাশ নভেম্বর, ২০২১, পৃষ্ঠা -৮৫, ৯২
স্ট্রেফসরুড, রেভাঃ এল. ও.; হুড় কোরেন মারে হাপডাম কো রেয়াঃ কাথা, পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি আকাদেমি, আকাদেমি
কতুক প্রকাশ - ২০১০, পৃষ্ঠা - ১৮৪-১৮৫